পথের টানে

চাঁদের পাহাড়ের দেশে

রাজর্ষি পাল

লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর থেকে প্রায় দশ ঘণ্টার বিমানযাত্রার পর পৌঁছলাম দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী জোহান্নেসবার্গে। আমার পরবর্তী যাত্রাস্থল জিম্বাবোয়ের ভিক্টোরিয়া ফলস। উনিশ শতকের বিখ্যাত ভূপর্যটক ডেভিড লিভিংস্টোন আবিষ্কার করেন আফ্রিকা মহাদেশের দুর্গমতম অঞ্চলে অবস্থিত বিশ্বের গভীরতম এই জলপ্রপাত। একশো বছর আগে এই জিম্বাবোয়েরই নাম ছিল রোডেশিয়া—বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়ে'র সেই দেশ যেখানে শঙ্কর এবং ডিয়েগো আলভারেজ পাড়ি দিয়েছিল রহস্যময় হীরের খনির সন্ধানে।

পেশায় আমি চিকিৎসক, ইংল্যান্ডে কর্মরত। নেশা চিরকালই অ্যাডভেঞ্চার। পৃথিবীর অনেক দুর্গম স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার আছে। অত্যন্ত বিপজ্জনক এই নেশা, কিন্তু এর মজাই আলাদা।

জোহান্নেসবার্গ বিমানবন্দরে প্রায় ঘণ্টা চারেক বসে থাকার পর উঠলাম আমার নির্দিষ্ট বিমানে। ছোট বিমান আফ্রিকা মহাদেশের ওপর

'এ যে বিশ্ব দেখি অন্য!' লোহায়-লোহায় ঘষে আগুন জ্বালানো, আর শিকার-করা পশুর মাংস ঝলসে খাওয়া। প্রবল খরস্রোতা জাম্বেজি নদীতে র‍্যাফ্‌টিং, আর র‍্যাফ্‌ট উল্টে জলে পড়ে অন্যদেশে চলে যাওয়া। রাতে তাঁবুর পাশে সিংহের গর্জন। আফ্রিকার দুর্গমতম অঞ্চলে সারভাইভাল কোর্স করে এলেন 'ঘরকুনো' বাঙালির ছেলে!

দিয়ে উড়ে চলল। তলায় আফ্রিকার দিগন্তবিস্তৃত সাভান্না। বহু ওপর থেকে দেখা গেল ওকাভাঙ্গ-এর ডেল্টা। একটা নদী শত শত শাখায় বিভক্ত হয়ে মহাদেশের অভ্যন্তরেই সৃষ্টি করেছে ব-দ্বীপের মতন এক ভূখণ্ড। শতসহস্র বন্য জীবজন্তুর আবাস এই ওকাভাঙ্গ, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর সৌজন্যে আজ যা গোটা পৃথিবীতে পরিচিত।

ঘণ্টা দুই ওড়ার পর নির্দিষ্ট বিমানবন্দরের ওপর এসে চক্কর দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল বিমান। অবশেষে ভিক্টোরিয়া ফলস-এ নামলাম।

ইমিগ্রেশনের লম্বা লাইন। আমার ডাক আসতে আসতে লাগল প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। ক্লান্তদেহে লাগেজ টেনে কোনওমতে বিমানবন্দরের বাইরে এলাম। আমার জন্য অপেক্ষারত নাইজেল প্রায় হাল ছেড়ে দেওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছিল।

সারভাইভাল কোর্স করতে এসেছি এখানে। দলের অন্যরা আগেই বেরিয়ে এসেছে। আমার অপেক্ষায় রয়েছে সকলে। ল্যান্ডরোভারে উঠলাম। স্টিয়ারিং-এ ডীন—আমাদের দলের নেতা-কাম-অভিভাবক।

ওকাভাঙ্গ জঙ্গলের মধ্যে ফরেস্ট রেঞ্জারদের অফিস আর গেস্ট হাউস। এখান থেকে এক বিস্তীর্ণ এলাকার জঙ্গলের জীবজন্তুদের ওপর নজর রাখা হয় আর চোরাশিকারিদের হাত থেকে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সারা পৃথিবী থেকে ভলান্টিয়াররা এখানে আসে কনজারভেশন-এর কাজে সাহায্য করতে। এমনকী তাদের অনেকে অস্ত্রচালনায় ট্রেনিং নিয়ে সশস্ত্র চোরাকারবারিদের সঙ্গে প্রয়োজনে সম্মুখ সমরে যেতেও প্রস্তুত। ওকাভাঙ্গ-এ পৌঁছে দলের অন্যদের সঙ্গে পরিচয় হল। কানাডা থেকে এসেছে ক্যাম—বিশাল বপু, মনোরোগবিশেষজ্ঞ। সুইজারল্যান্ড থেকে লুকা—আগে ছিল মিলিটারি অফিসার, বছর খানেক আগে স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছে; দেখতে যেন স্কুলবয়, সাংঘাতিক শারীরিক ফিটনেস। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জিয়ান, পেশায় খনি-বিশেষজ্ঞ। স্পেন থেকে হেলেন এবং জেমস। হেলেন ফ্যাশন-ডিজাইনার এবং জেমস ফরেন্সিক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। জিম্বাবোয়ের ওয়াইল্ড-লাইফ গাইড রিচার্ড। আমাদের ইন্সট্রাক্টররা হল : নাইজেল—জিম্বাবোয়ের শ্বেতাঙ্গ এবং ব্রিটিশ মিলিটারি থেকে অবসরপ্রাপ্ত, পল—সমস্ত রকম অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস বিশেষজ্ঞ, ডীন—দলে প্রবীণতম এবং সবচেয়ে অভিজ্ঞ। সে আবার স্থানীয় কনজারভেশন প্রোজেক্ট-এর প্রধান।

সামান্য কিছু খেয়ে আমাদের জিনিস গুছিয়ে নেওয়া হল। যেহেতু সারভাইভাল কোর্স, তাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া আর কিছু নেওয়া বারণ। ছোট একটা রুকস্যাক, তার মধ্যে স্লিপিং ব্যাগ, ম্যাট্রেস, জলের বোতল, হান্টিং নাইফ বা শিকারের ছুরি।

নিকষ কালো অন্ধকারের বুক চিরে উঁচু-নিচু রাস্তায় লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলল আমাদের ল্যান্ডরোভার। দুপাশে গভীর জঙ্গল। যদিও জুন মাস, দক্ষিণ গোলার্ধে এখন শীতকাল। অন্ধকার নামার পর থেকে জাঁকিয়ে পড়ল শীত।

প্রায় ঘণ্টা দুই চলার পর থামলাম। হেড লাইটের আলোয় দেখলাম জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গা কিছুটা। গাড়ি থেকে নেমে চারপাশ থেকে শুকনো কাঠ জোগাড় করে জ্বালানো হল আগুন। হাত-পা সেঁকে নিয়ে শুরু হল তাঁবু খাটানোর পালা। ছোট ছোট তাঁবু। এক-একটাতে দুজন করে। আমার সঙ্গী হল ক্যাম।

আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসলাম আমরা। স্থানীয় বাজরা জাতীয় আটা জলে গুলে আগুনে সেদ্ধ করে সাঙ্গ হল রাতের খাবার। আমাদের ক্যাম্পের পাশে কিছুটা নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাসুই নদী—কুমিরে ভরা। রক্ষা যে আমরা রয়েছি বেশ কিছুটা ওপরে, কুমিরদের নাগালের বাইরে। আমরা

আসার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের গাছগুলো থেকে নাগাড়ে শুরু হয়েছিল বেবুনদের চিৎকার। ভীত-সন্ত্রস্ত বেবুনের দল দুদ্দাড় করে গাছ থেকে নেমে দূরে পালিয়ে গেল। কিছু বেবুন আবার মাসুই নদীতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে ওপারে পালাল। অবশ্য পরের রাতগুলিতে বেবুনরা বন্য জানোয়ারদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের কাছের গাছগুলোতে সন্ধে হতেই হুড়োহুড়ি করে এসে উঠত।.

সেই রাতে আর বিশেষ কিছু নয়। তাঁবুর মধ্যে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকে শীতের হাত থেকে রক্ষে। ক্যাম্পের বাইরে জ্বলছে আগুন, যা বুনো জানোয়ারদের হাত থেকে রক্ষা করবে বলে আশা। এছাড়া রয়েছে ইন্সট্রাক্টরদের রাইফেল আর আমাদের হান্টিং নাইফ—আত্মরক্ষার শেষ উপায়।

রাতে বেবুনদের চিৎকারে মাঝে-মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল। তবে অন্য কোনও বিপদ হল না। ভোরবেলায় পাখির ডাকে ঘুম ভাঙলে তাঁবুর বাইরে এলাম। ক্যাম্পফায়ারের আগুনে জল গরম করে চা পান করা হল। জঙ্গলের মধ্যে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে প্রাতঃকৃত্য। এরপর গা গরম করার জন্য এক্সারসাইজ আর মার্শাল আর্টের প্র্যাকটিস।

গরম জলে পরিজ জাতীয় জিনিসগুলো খেয়ে আবার ল্যান্ডরোভারে ওঠা হল। আজকের পাঠ জঙ্গল পরিচিতি এবং বন্য জন্তুদের সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা। জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে ঘুরলাম। সঙ্গে ডীনের উদ্যত রাইফেল। গাছপালা এবং স্থানীয় ভূপ্রকৃতি চিনলাম। চিনলাম বাওবাব গাছ। এই গাছ কাণ্ডে জল জমা করে রাখে; কাণ্ডের নিচের দিকটা সরু এবং ওপরের দিকটা মোটা। এক জায়গায় গাছের বাকল ফালাফালা করে কাটা—বুনো হাতির কাজ। চিনলাম ধুলোর ওপর বিভিন্ন জন্তুর পায়ের ছাপ।

পৌঁছলাম মাসুই নদীর বাঁধের ধারে। এখানে নদী অনেকটা প্রশস্ত। নানা জন্তুর পায়ের ছাপ। বুনো হাতির শুকনো মলের মধ্যে আবিষ্কার করা হল এক ধরনের আখরোট জাতীয় বাদাম। এইসব বাদামগাছ জন্মায় এখান থেকে বহু দূরে পার্বত্য অঞ্চলে। বুনো হাতি গাছ এবং ফল খেয়ে বহু মাইল হেঁটে মাসুই নদীতে আসে জল খেতে। কিছু এই ধরনের বাদাম জোগাড় করে পাথর দিয়ে ভেঙে খাওয়া হল ভেতরের শাঁস। দিব্যি খেতে।

এরপর গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে আমরা ক্যাম্পে ফিরি। কথা বলা বারণ, বুনো হিংস্র জন্তু আকৃষ্ট হবে এই ভয়ে। আকার-ইঙ্গিতে সারতে হল কাজ। জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় বিশাল এক জানোয়ারের কঙ্কাল। বুনো হাতির পায়ে পায়ে হাড়গুলো ছড়িয়ে গেছে। দেখলাম সজারুর গর্ত, পাহাড়ের এক জায়গায় বুনো হাতির স্লিপ খেয়ে নিচে নামার জায়গা, নানা ধরনের কীট, পতঙ্গ, বিষাক্ত প্রজাপতি, এক বিশেষ ধরনের মাকড়সার জাল। জঙ্গলের এসব ব্যাপারে ডীন এবং রিচার্ডের জ্ঞান অসাধারণ।

ক্যাম্পে ফিরে মধ্যাহ্নভোজ সারা হল। এরপর দুই গাছের মধ্যে মাউন্টেনিয়ারিং-এর দড়ি বেঁধে প্র্যাকটিস করা হল টাইরেলিওন—দড়িতে ঝুলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া।

এরপর জঙ্গলের মধ্যে শুকনো কাঠ এবং ঝোপ কেটে আশ্রয়স্থল বানানোর পালা। দুজন করে এক-একটা দলে ভাগ হয়ে আমরা বুনো জন্তুদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ধরনের আশ্রয়স্থল বানাতে শিখলাম। সর্বক্ষণ দুজন রেঞ্জার রাইফেল হাতে করে চারপাশে নজর রাখছিল।

বিকেল বেলায় ক্যাম্পের আগুনের চারপাশে বসে গল্পগুজব। সেঞ্জেনি বলে একজন ফরেস্ট রেঞ্জার নিজের কাটা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শোনাল তার গল্প। মাসুই নদীতে সেঞ্জেনি ধরছিল মাছ। পাশে এক বন্ধু। আচমকা নদী থেকে উঠে এসে এক

বিশাল কুমির তার পা কামড়ে ধরে নদীতে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। সেঞ্জেনির সঙ্গী তাকে ফেলে পালায়। এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর সেঞ্জেনি নিজেকে রক্ষা করে কিন্তু কুমির তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল কামড় দিয়ে নিয়ে চলে যায়।

সন্ধের একটু আগে আমরা বেরলাম পায়ে হেঁটে ক্যাম্পের চারপাশে বেড়াতে। সবাই কাছাকাছি রইলাম। ঝোপঝাড়-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা অনেকটা দূরে চলে এসেছি। নিঃশব্দে চলেছি। হঠাৎ ডীন হাত তুলে থামতে বলল। কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করল। আমরাও এদিক-ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি কী হল। সূর্য তখন প্রায় ডুবছে। আমাদের বাঁ দিকের জঙ্গলের আড়ালে পাহাড়টা যেন একটু নড়ে উঠল। ধীরে ধীরে জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন আফ্রিকার সম্রাট—বিশাল চেহারার এক বুনো হাতি। আমরা দুদ্দাড় করে পিছিয়ে এলাম বেশ কিছুটা। ডীনের হাতে রাইফেল উদ্যত। আসন্ন বিপদের শঙ্কায় আমরা উত্তেজিত। ডীনের পেছনে দাঁড়ালাম আমরা। নীরব প্রত্যেকেই। দুপক্ষই একে অপরকে নিঃশব্দে মাপছে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। অবশেষে সম্রাট ধীরে ধীরে আমাদের ডানদিকের জঙ্গলের আড়ালে চলে গেলেন। আমরাও পিছু হটে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। তবে হাতি সারারাত রইল ক্যাম্পের বেশ কাছেই। গাছের ডালপালা ভাঙার শব্দ শোনা গেল সারারাত।

যবের আটা জলে সেদ্ধ করে আর তার সঙ্গে সবজি সেদ্ধ খেয়ে সাঙ্গ হল নৈশভোজ। ক্যাম্পের আগুনের চারপাশে বসে আমরা। অজানা আশঙ্কায় ভরা এই রাত। সন্ধের পরেই পালে পালে বেবুন দুদ্দাড় করে আমাদের আশেপাশের গাছগুলোতে এসে উঠল। মানুষের ভয় আজ ওরা কাটিয়ে উঠেছে। মানুষের কাছাকাছি থাকলেই যে অনেক বিপদের হাত থেকে রক্ষা সেটা বুঝেছে আশা করি। শীতের অন্ধকার রাত নামল নিবিড় হয়ে। আগুন ভালভাবে উসকে দিয়ে যে যার তাঁবুতে ঢুকলাম।

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, অথচ ঘুম আসছে না। গাছের ডালে ডালে বেবুনদের আওয়াজ এবং ডাকাডাকি। বুনো হাতির ডালপালা ভাঙার শব্দ। ভোররাতের তন্দ্রা ভেঙে গেল অন্য এক আওয়াজে, ক্যাম্পের খুব কাছ থেকে ডাকছে সিংহ। ক্যাম্পের দুপাশ থেকে দুটি সিংহ থেকে থেকে ডেকে চলল বাকি রাতটা। তাঁবুর ভেতরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাতটা পার করলাম।

দিনের আলো ফুটলে বেরুলাম তাঁবু থেকে। ক্যাম্পের আগুনে জল ফুটিয়ে চা এবং বাহুল্যহীন ব্রেকফাস্ট সারা হল। আগুনের চারপাশে একটাই উত্তেজিত আলোচনা—বুনো জানোয়ারদের প্রবল উপস্থিতি। রাইফেল হাতে সামরিক পোশাকে সজ্জিত ড্যামিয়েন এসে উপস্থিত হল আমাদের ক্যাম্পে। সে Anti-Poaching Foundation-এর ভলান্টিয়ার। আমরা কী পরিস্থিতিতে রয়েছি সরেজমিনে দেখতে এল।

যাই হোক, আমরা প্রস্তুত হলাম পরবর্তী যাত্রার জন্য। রুকস্যাক গুছিয়ে ল্যান্ডরোভারে বসলাম। আমাদের গন্তব্য জাম্বেজি নদী। সেই বিশ্ববিখ্যাত জাম্বেজি, যা সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর গভীরতম ভিক্টোরিয়া ফলস। যা অতিক্রম করে হীরের খনির সন্ধানে এগিয়ে গিয়েছিল শঙ্কর এবং ডিয়েগো আলভারেজ।

সাভান্না ভেদ করে এগিয়ে চলল আমাদের রোভার। এক জায়গায় দেখা হল তিনটি গণ্ডারের সঙ্গে—মা গণ্ডার এবং প্রমাণ সাইজের দুটি সন্তান। চোরাশিকারিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সবারই খড়্গ কেটে দেওয়া হয়েছে। আমাদের রোভারের গায়ে গা চুলকে জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল ওরা।

জঙ্গল পেরিয়ে লাল মাটির রাস্তায় এসে

উঠলাম। যেন পুরুলিয়ার উষর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি। মাঝে মধ্যে জুলু আদিবাসীদের গ্রাম। এদিক-ওদিক ছড়ানো বুনো ঝোপের জঙ্গল। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর এক পাহাড়ের ওপরে এসে থামলাম। সামনেই খাড়া জাম্বেজি ভ্যালি। মাথায় হেলমেট আর গায়ে লাইফ জ্যাকেট পরে অত্যন্ত খাড়াই বিপজ্জনক ঢাল বেয়ে অতি সাবধানে পাহাড় থেকে জঙ্গল ভেদ করে নিচে নামলাম। বেশ অনেকটাই সময় লাগল।

সামনে প্রবল খরস্রোতা জাম্বেজি। বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করে উঠল। নামানো হল সঙ্গে করে আনা র‍্যাফ্টগুলো। বাতাস ভরে ফোলানো হল। হাতে দাঁড় নিয়ে র‍্যাফ্টে বসলাম। আমাদের র‍্যাফ্টিং ইন্সট্রাকটারের নাম ব্রেন্ট—প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। র‍্যাফ্টিং শুরু করার আগে হল একপ্রস্থ লেকচার—কী কী সতর্কতা নিতে হবে এবং কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হলে বা র‍্যাফ্ট উলটে গেলে কী করে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

খরস্রোতা জাম্বেজিতে শুরু হল র‍্যাফ্টিং। দুটো র‍্যাফ্টে ভাগাভাগি করে বসলাম। দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চললাম। বিশাল বিশাল ঢেউ আর মাঝে মধ্যে ছোট ছোট জলপ্রপাত। ব্রেন্টের নির্দেশ মেনে দাঁড় বাইতে লাগলাম। বিশাল বিশাল ঢেউ যেন র‍্যাফ্টকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে লাগল। উথাল-পাথাল হতে হতে এগিয়ে চললাম। বিশাল বিশাল ঢেউ ভেদ করে এগোতে লাগলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। এক বিশাল ঢেউ এসে আমাদের র‍্যাফ্ট উলটে দিল। পড়লাম জলে। আমি গিয়ে পড়লাম উলটানো র‍্যাফ্টের তলায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার, নাকে মুখে জল ঢুকছে। তার ওপর জাম্বেজিতে কুমিরের ভয়। মরণ যেন এক হাতের মধ্যে। কোনওমতে দমবন্ধ করে ডুবসাঁতার কেটে জলের তলা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। জলের ওপরে মাথা ভেসে উঠতেই বুক ভরে দম নিলাম।

তাকিয়ে দেখি সকলের অবস্থাই আমার মতন। অদ্ভুত এক কায়দায় ব্রেন্ট উলটে পড়া র‍্যাফ্টকে সোজা করল। কোনওমতে উঠলাম আবার র‍্যাফ্টে। যদিও খুবই শকিং অভিজ্ঞতা, তবু বলব আর দুদিন পরে যা ঘটেছিল তার তুলনায় এ কিছুই নয়।

ধাতস্থ হয়ে আবার দাঁড় বাইতে লাগলাম। এই অভিজ্ঞতার পর জাম্বেজির ঢেউগুলোকে আর ভয় নেই। এগিয়ে চললাম আমরা। এক জায়গায় র‍্যাফ্টগুলোকে দাঁড় করিয়ে রক ক্লাইম্বিং করে অনেকটা ওপরে উঠে একে একে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল আমাদের। একে বলে কনফিডেন্স জাম্প। এরপর আবার এগিয়ে চলা।

সূর্য তখন মধ্যগগন ছাড়িয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। র‍্যাফ্টিং করে আমরা চলে এসেছি প্রায় বিশ কিলোমিটার। এইসময় এক বিপদ ঘটল। জলের তলায় লুকনো ধারালো পাথরে ধাক্কা খেয়ে আমাদের র‍্যাফ্টে একটা বড় ফুটো হয়ে গেল। হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে একটা দিক গেল কাত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্যাডল করে তীরে ভেড়ানো হল র‍্যাফ্ট। পাথরের ওপর উঠে বিশ্রাম আর মাথা ঠান্ডা করা হল। তারপর অন্য র‍্যাফ্টে কিছু মালপত্র সরিয়ে ভাগাভাগি করে দুটো র‍্যাফ্টে অনেক হিসেব করে বসা হল। এরপর ধীরে ধীরে প্রায় পাড় ঘেঁষে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চললাম। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর তীরে ভিড়লাম।

পিঠে রুকস্যাক তুলে খাড়াই পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম আমরা। খাড়াই প্রায় এক কিলোমিটার উঠতে প্রাণান্তকর অবস্থা। র‍্যাফ্টগুলোর হাওয়া বের করে কয়েকজন স্থানীয় পোর্টার সেগুলোকে নিয়ে উঠতে লাগল। ওপরে পৌঁছে রুকস্যাক নামিয়ে ভদ্রস্থ জামাকাপড় পরলাম। ক্যাম্পে ফেরার পথে জঙ্গলের মধ্যে আবার দেখা সেই তিনটে গণ্ডারের সঙ্গে। মনে হল

আমাদের চিনতে পেরেছে। আমাদের ল্যান্ডরোভারের গায়ে গা ঘষে বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দেখে আবার জঙ্গলে ঢুকে গেল।

খাবার খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হলাম। এক কাপ কফি খেয়ে ফার্স্ট-এড প্র্যাকটিস করা হল। জঙ্গলে কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হলে কীভাবে প্রাথমিক শুশ্রূষা করা যায় এবং কীভাবে আহতকে বিপজ্জনক জায়গা থেকে সরিয়ে আনা যায় তার ট্রেনিং হল। ডাক্তারির অভিজ্ঞতা থেকে আমিও কিছু জ্ঞান দান করলাম। রাত নেমে এল গভীর হয়ে। শুকনো কাঠ জোগাড় করে জ্বালানো হল আগুন। অন্ধকারের সঙ্গে নামল দক্ষিণ গোলার্ধের শীত। পাখির কলকাকলি থেমে গিয়ে জেগে উঠতে লাগল শ্বাপদসংকুল বন্য আফ্রিকা। চিৎকার করে হুটোপাটি করতে করতে দলে দলে বেবুন আশেপাশের গাছগুলোতে উঠতে লাগল। আগুনের বৃত্তের বাইরে দৃষ্টি চলে না। আমরা রইলাম আগুনের কাছাকাছি। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়ে চারপাশে নজর রাখা হল। নৈশাহারের পর আগুন উসকে দিয়ে ক্লান্তদেহে ঢুকলাম তাঁবুতে। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে মিলল শীতের হাত থেকে নিস্তার। ঘুম নেমে এল গভীর হয়ে। ভোর রাতে আবার ঘুম ভাঙল সিংহের ডাকে। চুপ করে শুয়ে রইলাম দমবন্ধ করে। অনেকক্ষণ ধরে ডেকে ডেকে থেমে গেল সিংহের ডাক।

পরদিন রুকস্যাক পিঠে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। জঙ্গলের পথ ধরে এক লাইনে এগিয়ে চললাম। সামনে ডীন, হাতে রাইফেল। ঘন ঝোপঝাড় ভেদ করে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। এই এলাকায় প্রচুর বুনো হাতির আবাস। একটা জলাশয়ের পাশে চোখে পড়ল একটা কচ্ছপ, গায়ে চিতা বাঘের মতো ছোপ ছোপ—নাম লেপার্ড টরটইস। বেশি বড় নয়। জলাশয়ের পাশ ধরে ধরে অনেকক্ষণ চলার পর ফের ধরলাম জঙ্গলের পথ। জঙ্গল ছাড়িয়ে কিছুটা খোলা জায়গা। এখানে ওখানে ঝোপঝাড়। তারপর উঠে গেছে অনুচ্চ পাহাড়ের সারি। ঝোপের আড়ালে চোখে পড়ল তিনটে জেব্রা। আমাদের সাড়া পেয়ে ঘাড় উঁচু করে দেখতে লাগল। আমরা বিপজ্জনক নই বুঝে আবার মাথা নামিয়ে ঝোপঝাড় চিবোতে লাগল। জেব্রা তৃণভোজী হলেও অত্যন্ত হিংস্র স্বভাবের। তার জন্য এদের পোষ মানানো সম্ভব হয়নি। সিংহ বা চিতার মতো দুর্ধর্ষ মাংসাশী প্রাণীও এদের শিকার করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করে। জেব্রার পেছনের পায়ের লাথি খেয়ে মারাত্মক জখম হয়েছে এরকম সিংহ বা চিতা কম নেই।

বাকিদের পেছনে রেখে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে আমি জেব্রাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। হাতে খোলা ক্যামেরা। সোজা না এগিয়ে এঁকে বেঁকে এগুতে লাগলাম। এতে সুবিধা যে জেব্রাগুলো অনর্থক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে না। তবে বিপদ এই, জেব্রাদের অনুসরণ করছে এমন কোনও সিংহ বা চিতার শিকার আমিই হয়ে যেতে পারি। চারপাশে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ নজর রেখে জেব্রাদের অনেকটা কাছে পৌঁছে গেলাম। জেব্রাগুলো মাঝেমধ্যে ঘাড় তুলে দেখছিল। তবে বিশেষ হিংস্র মনে হল না। হয়তো এই শ্বাপদসংকুল অরণ্যে আমি নিতান্তই নিরীহ! প্রায় পঁচিশ মিটার অবধি পৌঁছে কিছু ফটো তুলে আবার ফিরে এলাম।

পাহাড়ের নিচে শুকনো জঙ্গলের মধ্যে দেখা হল একপাল ইম্পালার সঙ্গে। এরা জেব্রাদের মতন নয়। বেশ লাজুক এবং ভীত স্বভাবের। আমাদের দূর থেকে দেখেই গাছপালার আড়াল দিয়ে দূরে সরে গেল। জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ঘুরে আমরা ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

দুপুরের পর এক বিশেষ ধরনের ট্রেনিং হল—camouflage বা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আত্মগোপন করে থাকার কৌশল। সামরিক বাহিনীর কমান্ডোদের বা ফরেস্ট রেঞ্জারদের এই ট্রেনিং

দেওয়া হয়। সারা গায়ে কাদা মেখে লতাপাতা রুকস্যাকে এবং হাতে-পায়ে বেঁধে জঙ্গলের সঙ্গে একদম মিশে যেতে হয়। নড়াচড়া একেবারেই বারণ। করলে শিকারিই শিকারে পরিণত হবে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। জলাশয়ের পাড়ে গিয়ে গায়ে মাথায় কাদা মেখে ভূত হলাম। তারপর ঝোপঝাড় থেকে শিকারের ছুরি দিয়ে লতাপাতা কেটে এখানে ওখানে গুঁজে নিলাম। এবার আত্মগোপন করার পালা। আমাদের কাজ হল জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকা। ডীন এবং অন্য ইনস্ট্রাক্টরদের কাজ আমাদের খুঁজে বের করা। এক-একজন এক-একটা জায়গায় গিয়ে লুকোলাম। তবে কাছাকাছিই রইলাম বুনো জন্তুদের ভয়ে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে যতটা সম্ভব নিশ্চল রইলাম। সামরিক বাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডীন, পল বা নাইজেলদের ফাঁকি দেওয়া কঠিন হল। একে-একে সবাই ধরা পড়ে গেলাম। অবশ্য স্থানীয় গাইড রিচার্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকার জীয়ানকে খুঁজতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

ক্যাম্পে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হলাম। চা পান করে প্র্যাকটিস করা হল দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার কৌশল—বিশাল একটা গাছের ডাল থেকে দড়ি ঝুলিয়ে পর্বত-আরোহণের টেকনিক।

আজ রাতই আমাদের শেষ রাত এই ক্যাম্পে। কাল ভোরে শুরু হবে আমাদের সারভাইভাল-এর আসল পরীক্ষা। পরের দুদিন আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে জাম্বেজি-পারের গভীর জঙ্গলে। খাবার-দাবার থেকে আশ্রয়স্থল—সবই আমাদের জোগাড় করতে হবে। দলবদ্ধভাবে সমস্ত বিপদ এবং সমস্যার সমাধান আমাদেরকে করতে হবে—ম্যানেজমেন্ট, ডিসিপ্লিন, টিমওয়ার্ক এবং কষ্টসহিষ্ণুতার এক চরম পরীক্ষা। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে আজকাল ম্যানেজমেন্ট-এ এইধরনের ট্রেনিং-এর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

আজকের রাত আর সেরকম সাঙ্ঘাতিক মনে হল না। ধীরে ধীরে আমরা এই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছি। অবচেতন মনে এই শ্বাপদসংকুল সাঙ্ঘাতিক বন্য আফ্রিকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছি। ভোর রাতেও সিংহের ডাক শোনা গিয়েছিল, তবে বেশ দূরে।

সকাল হতেই তোড়জোড়—ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলার পালা। তাড়াহুড়ো করে রুকস্যাক গোছানো হল। সামান্য কিছু খেয়ে ওঠা হল ল্যান্ডরোভারে। আগামী দুদিনে এটাই সম্ভবত আমাদের শেষ ভালভাবে খাওয়া। রোভার ছুটে চলল জাম্বেজির দিকে।

আজ আমরা জাম্বেজির অন্য এক জায়গায় এলাম। অত্যন্ত দুর্গম খাড়াই পাহাড় বেয়ে নেমে এলাম জাম্বেজির পাড়ে। এটা অন্য একটা পাড়। একটা বড় দিঘির একটা দিক যেন জাম্বেজিতে উন্মুক্ত। আপাত শান্ত এখানকার জল। কিন্তু আশেপাশে তাকাতেই চোখে পড়ল কিছুটা দূরে দু-একটা কুমির। মনে হল তারা বিরক্ত এবং সম্ভবত কিছুটা ভীত। পল একটা কায়াকে চড়ে একটা ছোট সাইজের কুমিরের দিকে দাঁড় বাইতেই সেটা জলে ঝাঁপ দিল। পরে পলের দুঃসাহসিকতার আরও পরিচয় পেয়েছি। ওর অন্য পেশা এবং নেশা হল সাপ ধরা। ব্ল্যাক মাম্বার মতন ভয়ংকর সাপ ধরা ওর কাজের মধ্যে পড়ে। ও একজন সর্পবিশারদও বটে এবং আফ্রিকার দক্ষিণ দেশগুলোতে ও এক পরিচিত নাম।

লাইফ জ্যাকেট এবং মাথায় হেলমেট পরে তৈরি হলাম। শুরু হল দাঁড় বাওয়া। শান্ত জল পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করতে লাগলাম জাম্বেজির দুরন্ত ঢেউয়ের রাজত্বে। সকলেই গম্ভীর। কোনও এক অজানা আশঙ্কায় সবাই নিশ্চুপ। আকাশপ্রমাণ ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম। প্রচণ্ড স্রোতের তোড়ে আমাদের র‍্যাফ্‌ট উথাল-

পাথাল হতে লাগল। বেশ কয়েকবার র‍্যাফ্‌ট উলটোতে উলটোতে বেঁচে গেলাম। অবশেষে একটা ভয়ংকর ঢেউ পেরোতে গিয়ে স্রোতের ধাক্কায় র‍্যাফ্‌ট থেকে ছিটকে পড়লাম আমরা চারজন। ঘূর্ণিতে পড়ে নাকানি চোবানি খেতে লাগলাম। সাঁতারের সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফল হল। ঘূর্ণির টানে একবার তলিয়ে যাই জলের তলায়, তারপর আবার ভেসে উঠি। ঈশ্বরের হাতে সব ছেড়ে দিলাম। মনে মনে ভাবছি এই শেষ। নিজেকে বলছি—Stay calm—শান্ত হও। তখন একটাই প্রচেষ্টা—জলের ওপরে মাথা উঠলেই চেষ্টা করছি দম নিতে। কিন্তু তাতেও বিপত্তি—নাকে-মুখে জল ঢুকে যাচ্ছে ।

দ্বিতীয় র‍্যাফ্‌ট আমাদের উদ্ধার করতে এল। বাকি তিনজনকে ওরা উদ্ধার করতে সফল হল, সম্ভব হল না আমাকে। একটা দাঁড় আমার দিকে ওরা বাড়িয়ে দিয়েছিল। একচুলের জন্য সেটা আমার হাত থেকে ফস্কে গেল। ঘূর্ণির স্রোত আমাকে প্রবল বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অন্য দিকে আর র‍্যাফ্‌টটাকে ঠেলে দেয় অন্য দিকে। এক মহাকায় ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে পড়ে যেন আমি ঘুরতে লাগলাম।

প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু জাম্বেজি নদীর দেবতা ক্ষমা করে দিলেন। আগের কোনও পুণ্যের জোরে বেঁচে গেলাম এবং সুযোগ পেলাম আজ আমার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে।

স্রোতের টানে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মনে হল যেন স্রোতের বেগ কমার দিকে। দেখলাম র‍্যাফ্‌টগুলো থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। জাম্বেজি নদীর একদিকের দেশ জিম্বাবোয়ে আর অন্য দিকে জাম্বিয়া। আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম জিম্বাবোয়ে থেকে। ঘূর্ণির টান দেখলাম আমাকে টেনে এনেছে জাম্বিয়ার দিকে। স্রোতের বেগ কমলেও তখনও প্রবল। সাঁতার কাটা তখনও সম্ভব নয়। ঘুরতে ঘুরতে পাড়ের অনেকটা কাছে চলে এলাম। স্রোতের বেগ বেশ কিছুটা কমে গেল। শুরু করলাম সাঁতার কাটা, পৌঁছলাম জাম্বিয়ার পাড়ে।

কুমিরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে এলাম জল থেকে। ছোটবড় পাথরের বোল্ডারে ভরা পাড়। তারপরে গভীর জঙ্গলে ঢাকা খাড়া পাহাড়। রক-ক্লাইম্বিং করে উঠলাম একটা উঁচু বোল্ডারের ওপর। তখনও আমার বাঁ হাতে ধরা একটা প্যাডল বা দাঁড় এবং ডান হাতে আমার ওয়াটার প্রুফ ক্যামেরা। প্রবল স্রোতের মধ্যেও হাতছাড়া করিনি। আমার ঠিক নিচেই জাম্বেজি। কুমিরের আক্রমণ থেকে বাঁচার এক মাত্র অস্ত্র আমার দাঁড়। আক্রমণ করলে অন্তত দু-ঘা বসাতে পারব।

আমার অবস্থায় আমি নিজেই তখন হাসছি। অ্যাডভেঞ্চার করার শখ আমার কানায় কানায় পূর্ণ হল। এবার বাঁচার রাস্তা খুঁজতে হবে। পেছনে জঙ্গলে ঢাকা খাড়া পাহাড় আর সামনে কুমিরে ভরা ভয়ংকর জাম্বেজি। বহু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের র‍্যাফ্‌টগুলো। মনে হল ওরা দেখতে পেয়েছে যে আমি প্রাণে বেঁচে পাড়ে উঠেছি। চিৎকার করে ডাকার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হল। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল আমার চিৎকার। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম একটা কায়াকে চেপে একজন আমার দিকে আসছে। সে ভুসা, স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ যুবক। কায়াকিং-এ এক্সপার্ট। ওপর থেকে দেখলাম অদ্ভুত কায়দায় কায়াকিং করে জাম্বেজির প্রবল ঢেউগুলোকে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে আসছে। ভুসা চলে এল আমার একদম নিচে। ওর কথামতন জলে লাফিয়ে পড়লাম। কায়াকে ওঠার জায়গা নেই। ভুসার পরামর্শমতো হাত দিয়ে কায়াকের একটা দড়ি ধরে পা দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগলাম। ভুসা প্যাডল করে ঢেউগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল।

একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমার কাজ দুহাত দিয়ে কায়াকের দড়ি ধরে থাকা আর পা দিয়ে সাঁতার কাটা। বাকি কাজ ভুসার—দাঁড় বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলা। এ যেন মহাভারতের যুদ্ধ। আমি যেন অর্জুন আর ভুসা যেন কৃষ্ণ। আমার কাজ আমি করে চলেছি। আমার বাঁচা-মরার দায়িত্ব ভুসার হাতে... কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন...।

দুরন্ত জাম্বেজিতে নাকানি চোবানি খেতে খেতে শেষ অবধি পৌঁছলাম অন্য পাড়ে। র‍্যাফ্‌টে উঠে ধাতস্থ হতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ। অন্যরা নিশ্চুপ। পরে হেলেন বলল যে ওরা সবাই আমার জন্য প্রার্থনা করছিল। ব্রেন্ট বা ডীন ভয় পাচ্ছিল এই ভেবে, ঘূর্ণির টানে জলের তলায় পাথরের ফাটলে আটকে গেলে আমার মৃতদেহও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে। যাই হোক, নবজন্ম লাভ হল ভুসার কল্যাণে।

আবার এগিয়ে চলা। কিছুটা পাড় ঘেঁষে র‍্যাফ্‌টগুলো চলতে লাগল। সময় লাগল কিছু বেশি। একটা জায়গায় জাম্বেজি ঘুরে গেছে পাহাড়ের ওপারে। এখানে আমরা র‍্যাফ্‌ট থেকে নামলাম। মাউন্টেনিয়ারিং-এর দড়ি আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে পাথর আর বোল্ডারে ভরা পাড়ে নামলাম। কাঁটাগাছ আর গুল্মে ভরা পাহাড় বেয়ে যতটা সম্ভব ওঠা গেল। এরপর খাড়া পাহাড়। জাম্বেজি এখন অনেকটা নিচে। শুধু পায়ে হেঁটে ওঠা অসম্ভব। পা হড়কালে পাথরে আছাড় খেয়ে সোজা জাম্বেজিতে।

পাড় থেকে অনেকটা ভেতরে চলে এলাম। আমরা এখনও পাহাড়ের ওপর। এখানে জাম্বেজির একটা শাখানদী পাহাড়ের তলা দিয়ে বয়ে গেছে। নদীতে জল বেশি নেই। দড়ির একপ্রান্ত বেঁধে দেওয়া হল একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে। এরপর দড়ির অন্য প্রান্ত হাতে করে নিয়ে পল নেমে গেল পাহাড় থেকে। আধ-শুকনো নদীর খাত পেরিয়ে চলে গেল অন্য পাড়ে। সেখানে আর একটা গাছের গুঁড়িতে দড়ির অন্য প্রান্ত যতটা সম্ভব শক্ত করে বেঁধে আবার ফিরে এল এপারে।

এবার দড়ির সঙ্গে বাঁধা হল পর্বতারোহণের কিছু যন্ত্রপাতি। কোমরে বাঁধা হারনেসের সঙ্গে ক্যারাবিনার লাগিয়ে দড়িতে ঝুলে আমরা খাদের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলে গেলাম। এরপর দড়িদড়া আর যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে পাহাড় ভেদ করে আবার ফিরে এলাম জাম্বেজির অন্য পাশে। র‍্যাফ্‌টগুলো আগেই পৌঁছে গেছে। র‍্যাফ্‌টে বসে আবার শুরু হল দাঁড় বাওয়া।

সূর্য তখন অস্তাচলের পথে। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা নোঙর করলাম পাড়ে। পাড়ের এই দিকটা কিছুটা সমতল এবং বালুকাময়, তারপরে জঙ্গল এবং পাহাড়। এখানে আজকের মতন রাত্রিবাস। এখানে আমাদের খুঁজে নিতে হবে নিজেদের আশ্রয়স্থল এবং খাদ্য। সারাটা দিন কাটল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সারা দিনে পেটে কিছু পড়েনি। বুদ্ধি-সুদ্ধি সব গুলিয়ে যাচ্ছে। দুদলে ভাগ হয়ে আমরা জঙ্গলে ঢুকলাম। আমার দলে ছিল রিচার্ড, জিম্বাবোয়ের স্থানীয় গাইড। জঙ্গলের অন্ধি-সন্ধি সব ওর জানা। ওর কল্যাণে শিকার করা গেল এক পাহাড়ি ছাগল। নিয়ে আসা হল নদীর পাড়ে। অন্য দল এর মধ্যে জঙ্গল থেকে জোগাড় করেছে কিছু বুনো ফল এবং খাওয়া যায় এরকম কিছু গাছের পাতা। সূর্য তখন ডুবে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে।

একটা গাছের ডালে শিকারের পেছনের পা দুটো বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এরপর ছুরি দিয়ে ছাল ছাড়ানোর পালা। সন্ধ্যা চলে গিয়ে নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার। শুকনো ডালপালা জোগাড় করে একটা পাথরের আড়ালে জ্বালানো হল আগুন। দেশলাই নেই, কারণ এটা সারভাইভাল কোর্স। ফ্লিন্ট পদ্ধতিতে ছুরিতে লোহার

পেরেক ঘষে আগুনের ফুলকি শুকনো পাতার ওপর ফেলে জ্বালানো হল আগুন। তার ওপর চাপানো হল শুকনো কাঠ। আগুন জ্বলে উঠল বেশ ভালভাবেই। মাংসের টুকরো ছোট করে কেটে আগুনে ঝলসে কোনওরকমে ক্ষুধার নিবৃত্তি হল।

বলতে বা লিখতে যা সময় লাগল, বাস্তবে লাগল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সময়। প্রথমত সারা দিনের পরিশ্রমে আমরা শারীরিক বা মানসিকভাবে অত্যন্ত ক্লান্ত। তার ওপর এইভাবে আগুন জ্বালানো বা ছাল ছাড়িয়ে মাংস কাটা বা ঝলসানোর কাজে আমরা অভ্যস্ত নই। যাই হোক প্রায় ঘণ্টা চারেক লাগল এই কাজ শেষ করতে।

এবার বাসস্থানের সন্ধান। আজ আর তাঁবুর আরাম নেই। জঙ্গলের মধ্যে বা পাথরের আড়ালে নিরাপদ জায়গা খুঁজে রাত কাটাতে হবে আমাদের। নদীর বেশি কাছে থাকলে ভয় কুমিরের, জঙ্গলের মধ্যে সাপ বা বিছের। এছাড়া আছে অন্যান্য বুনো জন্তু। জঙ্গল আর বালিয়াড়ির মাঝামাঝি একটা বড়সড় পাথরের আড়াল খুঁজে পেলাম আমি। সেখানে মেলে দিলাম আমার ম্যাট্রেস। বাতাসে ফুলিয়ে নিলাম। স্লিপিং ব্যাগ বের করে মেলে দিলাম টর্চের আলোয়। শিকারের ছুরি খাপ থেকে বের করে হাতের নাগালের মধ্যে রাখলাম, প্রয়োজনে যাতে চট করে আত্মরক্ষা করা যায়। টর্চের আলোয় দেখে নিলাম বিপদ এলে কোন দিক থেকে আসতে পারে।

দলের অন্যরাও যে যার জায়গা খুঁজে নিয়েছে। সবাই কাছাকাছি রইলাম। রিচার্ড গেল নদীর দিকে বালির ওপর শুতে, যদিও কুমিরের ভয়। অবশ্য আমাদের থেকে ও অনেক বেশি জানে এই জায়গা সম্বন্ধে।

যদিও অত্যন্ত ক্লান্ত, ঘুম বেশি গভীর হল না। থেকে থেকে ভেঙে যেতে লাগল। ওপরে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যেতে লাগল তারায় ভরা পরিষ্কার আকাশ। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শুয়ে উপভোগ করতে লাগলাম প্রকৃতি দেবীর সৃষ্ট বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বের রহস্যময় সৌন্দর্য। অন্ধকার শীতল রাত, শোনা যাচ্ছে জাম্বেজির স্রোতের আওয়াজ। কখনও বা বাতাসে জেগে উঠছে জঙ্গলের ভেতরে গাছের পাতার মর্মরধ্বনি। শীতল, অন্ধকার, রহস্যময়, বিপজ্জনক, সুন্দর একটি রাত কাটল শ্বাপদসংকুল অরণ্যে।

রাতে আর কোনও বিপদ ঘটল না। ঘুম ভাঙল সূর্যোদয়ের সঙ্গে। নদীর ওপারে পাহাড়ের মাথায় জেগে উঠছেন সূর্যদেব। কাঠের আগুন উসকে দিয়ে গরম করা হল জল। ফোটানো জলে মাপোনি গাছের পাতা ফেলে সেদ্ধ করে খাওয়া হল। এই হল প্রাতরাশ। রুকস্যাক গুছিয়ে চলে এলাম নদীর পাড়ে। র‍্যাফ্‌টগুলোতে বাতাস ভরা আছে কি না দেখে নেওয়া হল। পেছনের বালুকা-রাশিতে পড়ে রইল আমাদের পদচিহ্নের উপাখ্যান। জাম্বেজির জলে ভেসে চলল আমাদের র‍্যাফ্‌ট।

দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চললাম। জাম্বেজির এই জায়গাতে স্রোতের বেগ কিছুটা কম। নেই আগের দিনের সেই ভয়ংকর ঢেউ। ঘণ্টাখানেক চলার পর আবার পাড়ে ভেড়ানো হল র‍্যাফ্‌টগুলো। জাম্বেজি এখানে ঘুরে পাহাড়ের অন্য দিকে চলে গেছে। আমরা পাড়ে নেমে উঠলাম পাহাড়ে। কাঁটাগাছ আর গুল্মে ভরা খাড়া পাহাড়। বেশ কিছুটা উঠে এবার আরও খাড়াই। বেশ অনেকটা নিচে জাম্বেজি। পা হড়কালে পাথরে আছাড় খেয়ে সোজা নদীতে।

রক-ক্লাইম্বিং করে পল খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে একদম ওপরে চলে গেল। ঝুলিয়ে দিল মাউন্টেনিয়ারিং-এর দড়ি। সেই দড়ি ধরে পর্বতারোহণের পদ্ধতি মেনে এক এক করে আমরা পাহাড়ের একদম ওপরে উঠলাম। বলতে যতটা সময় লাগল, বাস্তবে সময় লেগেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। এরপর পাহাড়ের অন্যদিকে নামার

পালা। পাথরে দড়ির একপ্রান্ত বেঁধে দিয়ে নিচে ঝুলিয়ে দেওয়া হল অন্য প্রান্ত। সেই দড়ি ধরে বিশেষ পদ্ধতিতে আমরা একে একে নিচে নেমে এলাম। পর্বতারোহণের ভাষায় এই পদ্ধতিকে বলে অ্যাবসেলিং।

অন্য দিকে পৌঁছে গেছে র‍্যাফ্টগুলো। আবার শুরু হল দাঁড় বাওয়া। আরও কিছুটা গিয়ে শেষ হল আমাদের র‍্যাফ্টিং। পাড়ে শেষ বারের মতন ভিড়ল র‍্যাফ্টগুলো। রুকস্যাক পিঠে নিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠা শুরু হল। এ এক সাঙ্ঘাতিক যাত্রা। অভুক্ত শরীরে খাড়া পাহাড় বেয়ে যেন একশো তলার বাড়িতে সিঁড়ি ভেঙে ওঠা। যতটা সম্ভব দ্রুতগতিতে উঠতে হবে, কারণ আমাদের উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করছে হেলিকপ্টার। দেরি হয়ে গেলে চলে যাবে।

ঘামতে ঘামতে শরীর থেকে কয়েক লিটার জল বেরিয়ে গেল। দ্রুতগতিতে চলছে শ্বাস। হৃৎস্পন্দন অতি দ্রুত, যেন হার্ট অ্যাটাক হবে। কিছুটা উঠে কয়েক সেকেন্ডের থামা, আবার এগিয়ে চলা। এ যেন মহাপ্রস্থানের যাত্রা। সামনে এগিয়ে চলো, পেছনে তাকাতে নেই।

এই ম্যারাথন স্প্রিন্টের যাত্রা একসময় শেষ হল। পাহাড় ভেঙে ওপরের সমতলভূমিতে পৌঁছলাম। লুকা আর ব্রেন্ট কিছুক্ষণ আগে পৌঁছে গেছে। শুকনো কাঠে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার সিগন্যাল দেওয়া হল। শোনা গেল হেলিকপ্টারের আওয়াজ। ধুলোর ঝড় তুলে কিছুটা দূরে নামল হেলিকপ্টার। ধুলোর মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়ে উঠলাম সবাই।

আকাশপথে উড়ে চললাম। বহু ওপর থেকে দেখা গেল জাম্বেজি নদীর উপত্যকা আর তার দুপাশের দানবাকৃতি পার্বত্য গর্জ। পেরিয়ে চললাম আফ্রিকার সাভান্না। পেরিয়ে চললাম অনেক ওপর থেকে দেখা ছোট ছোট জুলুদের গ্রামগুলো। জাম্বেজি নদীকে অন্যদিকে রেখে উড়ে চললাম।

ওকাভাঙ্গ কনজারভেন্সির বাইরে নামল কপ্টার। মাহিন্দ্রার জিপ নিয়ে অপেক্ষারত টারিন। জিপে করে ফিরে এলাম কনজারভেন্সির সুরক্ষিত বাংলোয়। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, অমানুষিক পরিশ্রমে, আর এই কদিনের না-কামানো মুখে আমাদের চেহারাগুলো হয়েছিল দেখার মতন। পরিশ্রান্ত দেহে আগে স্নানঘরে ঢুকে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হওয়া গেল। আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের এই হল আপাত সমাপ্তি। খাবার ঘরে গিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি হল। শ্রান্ত দেহে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

সন্ধের পর কনজারভেন্সির সুরক্ষিত বলয়ে আমাদের অনারে ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন করা হয়েছিল। আগুনের চারপাশে নৃত্যরত জুলুদের সুঠাম শরীরের বিভঙ্গ আর তারকাখচিত উন্মুক্ত আকাশ যেন আমাদের নিয়ে গিয়েছিল অন্য কোনও এক জগতে।

এর পরের গল্প সংক্ষিপ্ত। পরদিন ভোরে আমরা গিয়েছিলাম ভিক্টোরিয়া ফলস দেখতে। এখানে চাঁদের আলোয় রামধনু উঠে সৃষ্টি করে পাগল-করা এক মায়াবি জগৎ। এরপর আর দুদিন ছিলাম। একদিন গিয়েছিলাম সিংহ সংরক্ষণ কেন্দ্রে। নাম ALERT—African Lion and Environmental Research Trust. এরা জঙ্গল থেকে অনাথ সিংহশিশুদের উদ্ধার করে তিন ধাপে বড় করে আবার জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। আর একদিন গিয়েছিলাম ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে জঙ্গল সংরক্ষণের কাজে সাহায্য করতে। ✠